ফুলের মতো নবী

নাসির হেলাল

talbiaprokashon@gmail.com
fb/talbiaprokashon

তালবিয়া সংস্করণ ১ম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২৩
ISBN: 978-984-96869-6-5

ভূমিকা

সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় যত মানুষের জন্ম হয়েছে কিংবা কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ জন্ম নেবে সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ মানুষ, সবার চেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী মহামানব হলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্- যাঁকে আমরা আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ হিসেবেই জানি। আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে নিজেই বলেছেন- 'নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।' (সূরা আল কলম : ০৫)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে রব্বুল আলামীনের উক্ত সাক্ষ্য ও মূল্যায়ন তাঁর মহান চরিত্রের ব্যাপারে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি প্রদান করেছে। তিনিই হলেন অনুকরণ ও অসুরগণের পূর্ণতা। আল্লাহ তাআলা মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন- 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' (সূরা আহযাব : ২১)

প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ- এর চরিত্র ও আদর্শ হলো মহত্তম। সকল যুগের সকল মানুষের জন্য মহান রব্বুল আলামীন তাঁকে রহমতের দরিয়া হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি হলেন মানবজাতির জন্য বিশেষ রহমত স্বরূপ। আল্লাহ বলেন- 'আপনাকে কেবল সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।' (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

সেই মহামানব হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে নিয়ে *'ফুলের মতো নবী'* গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। এখানে মোট ৪৯টি শিরোনামে রাসূল ﷺ এর জন্ম থেকে ওফাত পর্যন্ত জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। পরিসর খুবই সীমিত হলেও চেষ্টা করেছি মৌলিক বিষয়গুলোর আলোচনা তুলে ধরার। এই গ্রন্থের বর্ণনাধারায় কাব্যিকতার আবহ রয়েছে। গদ্য হলেও সুপাঠ্য হিসেবে যা পাঠকমনে দোলা দেবে আশাকরি। মূলত *'ফুলের মতো নবী'*- গ্রন্থটি শিশু-কিশোরদের জন্য। তবে সকল শ্রেণির পাঠকের উপকারী পাঠ্যও বটে।

কবি *গোলাম মোস্তফার মরুদুলাল* থেকে শুরু করে আজ অবদি শিশু কিশোরদের জন্য অনেক সীরাত রচিত হয়েছে। *'ফুলের মতো নবী'* এমনই একটি নবীজীবনী। যেখানে উপস্থাপনে নিজস্বতার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন চেষ্টায় কতটা সফল হয়েছি।

আমার রচিত কিশোর-তরুণদের উপযোগী বইগুলোর মতো এটিও উপকারী হবে আশাকরি। তারই ধারাবাহিকতায় নবীজি ﷺ-কে নিয়ে এই ক্ষুদ্র জীবনীগ্রন্থটি পেশ করলাম। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা *'ফুলের মতো নবী'* গ্রন্থটির তালবিয়া প্রকাশন সংস্করণকে কবুল করুন। বইটি নবীজির আদর্শে জীবন রাঙাতে শিশু কিশোর তরুণ-তরুণীদের সহায়ক পাঠ্য হিসেবে অনুপ্রেরণার হোক। ওদের জীবন নববী ফুলের মতো সুবাসে ভরে উঠুক। আমীন।

আল্লাহ হাফিজ
নাসির হেলাল
১৩। ০৯। ২০২৩

সূচীপত্র

আবির্ভাবের পূর্বে আরব	১১
ক'দিন পর	১৪
আবির্ভাব	১৬
হালিমার ঘরে	১৮
শিক্ষা	২০
মা হারালেন শিশু নবী	২২
আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু	২৫
সিরিয়ায় বাণিজ্য	২৭
রাখাল নবী	৩২
ওকাজ মেলা ও হরবে ফোজ্জার	৩৪
আল আমীন	৩৬
শাদী মুবারক	৩৮
কাবা'র সংস্কার	৪২
সংসার জীবনে	৪৪
নবুয়ত লাভ	৪৭
গোপন দাওয়াত	৫৩
প্রকাশ্য দাওয়াত	৫৭
বাদ প্রতিবাদ এবং বিবাদ	৬১
অত্যাচার নিপীড়ন	৬৩
উৎপীড়ন	৬৬
ইয়াসির পরিবারের অগ্নিপরীক্ষা	৬৯
হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর উপর নির্যাতন	৭০
প্রলোভন	৭১
ইসলামের প্রথম শহীদ	৭৪
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অত্যাচার	৭৬
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দুর্ব্যবহার	৭৮
প্রথম হিজরত	৮০
নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ	৮৬
হযরত হামজার ইসলাম গ্রহণ	৮৭
সম্মিলিত শেষ আপোষ প্রস্তাব	৯০
ওমরের ইসলাম গ্রহণ	৯২
শিবে আবু তালিবে বন্দী	৯৬
আবু তালিব ও খাদীজার ইন্তেকাল	১০২

তায়েফ গমন	১০৪
আকাবার শপথ	১০৬
মিরাজ গমন	১০৮
হিজরত	১১১
মসজিদে নববী নির্মাণ	১১৯
কবে থেকে আযান হলো?	১২২
আনসার-মুহাজির ভাই ভাই	১২৪
ঐতিহাসিক মদীনা সনদ	১২৬
ষড়যন্ত্র, চারিদিকে শুধু ষড়যন্ত্র	১২৮
বদর যুদ্ধ	১৩১
ওহুদ যুদ্ধ	১৩৫
খন্দক যুদ্ধ	১৩৮
হুদাবিয়ার সন্ধি	১৪১
খায়বার যুদ্ধ	১৪৩
মক্কা বিজয়	১৪৪
বিদায় হজ্ব	১৪৭
ওফাত	১৫০

আবির্ভাবের পূর্বে আরব

সত্যের সোনালী সুরুজটা দিনে দিনে একদিন তলিয়ে গেলো। তলিয়ে গেলো সুন্দরের লাল গোলক। এমনি ধারা এর আগেও দুনিয়ার পৃষ্ঠে ঘটেছে। একেক জন সাহসী মানুষ সত্যের সোনালী সুরুজটা হাতে ধরে যোজন যোজন পথ পাড়ি দিয়েছেন। চেষ্টা চালিয়েছেন মানুষের মনের জমিনে বুনে দিতে ঈমানের বীজ। অনেকেই এ কাজে সফলতা লাভ করেছেন। আবার অনেকে তেমন কোনো ফল লাভ করতে পারেননি। তবুও তাঁরা থামেননি, থামাননি তাঁদের পথ চলা। ভোলেননি তাঁদের ওপর দেয়া পবিত্র দায়িত্বের কথা। তাঁদের শেখানো এ দায়িত্বের কথা যারা এটে নিয়েছিলো মনের দেয়ালে, সময়ের ফাঁক-ফোকরে তা আস্তে আস্তে উধাও হয়েছে। উধাও হয়েছে বিশ্বাসের শেষ ডিমটিও তাদের অবর্তমানে। আর সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছে অবিশ্বাসী আজাজীলের চেলারা। হাতে নিয়ে তাল তাল অন্ধকার। এক সময় পুরো মানুষগুলোর সামনে টেনে দিয়েছে অসত্যের কালো পর্দা।

ঠিক তেমনিভাবে, আজ থেকে পনের'শ বছর আগে আরব জাতির বিশ্বাসের সংসারে নেমে এসেছিলো অশিক্ষা, কুশিক্ষার জাহিলিয়াত। সোহাগ, আনন্দ, ভালবাসার জায়গায় বাসা বেঁধেছিলো অত্যাচার, অনাচার আর কঠোরতা। অন্যায়ের বর্শার ডগায় ফালাফালা হয়েছিলো শান্তির শ্বেত কপোতেরা। যন্ত্রণায় ছট ফট করতে করতে নেমে এসেছিলো অশান্তির ড্রেনে। টুপ করে ডুবে গিয়েছিলো। হারিয়ে গিয়েছিলো। তারপর বহুযুগ পার হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে রূপালী দুনিয়ার অনেক কিছুই। তবে পরিবর্তন আসেনি মানুষের চিন্তার। মনের। তবে হা! পরিবর্তন যে হয়নি তা কিন্তু নয়। পরিবর্তন হয়েছে। এবং তা' ক্রমাগতভাবে কালো থাবা বিস্তারকারী আল্লাহহীনতার দিকে। চরম বিপর্যয়ের দিকে।

সত্যের ধারকবাহক নবী-রাসূলের দেখানো সোনালী প্রভাতের রক্তিম আভাকে দূরে ঠেলে দিয়ে হাটি-হাটি পা করে মনগড়া কল্পিত দেবদেবীর পূজা-অর্চনার দিকে এগিয়েছে তাদের পথচলা। এ পথচলা ক্রমেই দ্রুত থেকে দ্রুত হয়েছে। তারপর এক সময় চরম বিপর্যয় তাদেরকে ঘিরে ধরেছে। বিষ পিঁপড়ের মতো হুড়মুড় করে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে অন্যায়ের কলসীর ভেতর।

দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে তাঁরা একসময় নিজেদের ভেতর রেষারেষির গণগণে আগ্নেয়গিরির জন্ম দিয়েছে। কোষমুক্ত হয়েছে ঝলকানি দেওয়া তরবারি। গড়িয়ে পড়েছে শত্রুপক্ষের আক্রমণাত্মক মাথা। লালে লাল হয়েছে মরুভূমির তপ্ত বালু। কলজে ফাটা আর্তচিৎকার ধ্বনিত হয়েছে অসহায় মানুষের। মরুভূমির লু-হওয়া সে চিৎকারে বড্ড বেরহম হয়েছে। ঝন্ ঝন্ শব্দে বেজে উঠেছে পরস্পরের কোষমুক্ত তরবারি বারবার। চক্‌চকে তরবারির ঝিলিক ঠাট্টা করেছে শয়তানের হাসিকে। যুগের পর যুগ চলেছে এ যুদ্ধ। প্রতিশোধের লাল বেলুনটি চুপসায়নি দীর্ঘ পক্রিমার পরেও। বরং ফুলে ফেঁপে তা চক্রবৃদ্ধি আকারে বড় হয়েছে। অহংকার আর আমিত্ব তাদের নিবাস ছেড়ে আস্তানা গেড়েছে এসব মানুষের মনে। মনের দরোজা খোলা পেয়ে সোজাসুজি জমা হয়েছে। এরপর অবস্থা, সময়, কাল বুঝে ঈমানের দরজা ফুটো করে প্রকাশিত হয়েছে।

অবস্থা এতোটা নিচে নেমেছে মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে তাদের অহমিকায় বাঁধতো। তাই দেরি না করে সদ্যজাত তুলতুলে বাচ্চাটিকে পাঠিয়ে দিয়েছে দূরে, অনেক দূরে। তাকে এ দুনিয়া থেকে ফারাক করে দিয়েছে আঙ্গুলের কঠিন চাপে। কত কাতর অনুনয়। চাহনী। আব্বা আব্বা চিৎকার। কোনো কিছুই পাষাণ হৃদয় এ সমস্ত বাপদেরকে বিরত রাখতে পারেনি। না! স্নেহ। মমতা। আল্লাহর ভয়। কোনো কিছুতেই না। অনেক সময় দেখা গেছে লাত, মানাত, হোবল প্রমুখ দেবদেবীদের সন্তুষ্টির জন্যে হাঁস মুরগির মতো জবাই করেছে কলিজার টুকরো সন্তানদের। দেবদেবীরা আনন্দিত হবে বলে ভালবাসার লাল জবাটিকে গলাটিপে মারতে তারা কসুর করেনি। উপরন্ত এসমস্ত কাজ করে তারা মানবতার চরমতম শত্রু আজাজীলের মতো খিক্ খিক্ করে হেসেছে।

আবির্ভাব

আবরাহা ও তার দলবলের এ মর্মান্তিক অবস্থা দেখে অনেকেই চুপসে গেলো। আকাশ-পাতাল ভাবাভাবি শুরু করলো। মরুভূমি পর্যন্ত চিন্তার অথৈ সাগরে ডুব দিলো। গাছপালা যেন কিসের ইংগিত পেলো। দীর্ঘদিন আজাজিলের রাজ্যে বাস করে গাছপালা, পাখপাখালি, সকলেই হাস্‌ফাস্‌ করছিলো। অবসন্ন মনে তারা একটা পরিবর্তন আশা করছিলো। আহা! এ সময় যদি নূরের তাজ পরা ঝলমলে এক রাজপুত্তুর এসে বলতো আজ থেকে তোমাদের আর কোনো কষ্ট থাকবে না। দুঃখ থাকবে না। আহা! যদি অন্যায়ের প্রাসাদাগুলো একরাত্রের মধ্যেই উধাও হয়ে যেতো। সেখানে এসে হাজির হতো সত্যের সোনালী পাহাড়। তা হলে কি মজাটাই না হতো। সেই যে রূপকথার মতো। মুখ দিয়ে শুধু হুকুম করলেই সাথে সাথে সব হাজির। সেই রাজপুত্তুর যদি পঙ্খিরাজের পিঠে চড়ে এ রাজ্যে আসতো। তাড়িয়ে দিতো অকল্যাণের রাজা আজাজিলকে। তা হলেই মানুষের মনে শান্তি ফিরতো। হানাহানি, কাটাকাটি বন্ধ হতো। গান ধরতো পিও পাপিয়া। টস্‌টসে খোরমার মউমউ গন্ধে ভরে যেত সবার মন।

গাছগাছালি সবাই যখন আশার বীজ বুনছে, করুণাময় যেন নিবিড়ভাবে তা উপভোগ করছেন। সৃষ্টির মনে যখন আশার প্রজাপতিরা দাপাদাপি করে, স্রষ্টা কি পারেন, তার সাধের সৃষ্টির আশা অপূর্ণ রাখতে? পারেন কি তাঁর মহব্বতের সৃষ্টিকে সঠিক পথের সন্ধান না দিয়ে?

৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে আগস্ট মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সত্যিসত্যিই ঝলমলে এক রাজপুত্তুর নেমে এলেন। পঙ্খিরাজে চড়ে নয়। আকাশ থেকেও নয়। মর্তের মানবী মা আমিনার কোল জুড়ে। তাঁর সে ঝলমলে রূপালী রঙে রঙিন হলো আকাশ ও পৃথিবীর ফেরেশতারা। ঘুরেঘুরে তারা আল্লাহর মহিমা গান গাইলো। এতোদিনকার হাস্যময়ী চাঁদ, সুরুজ শরমে মুখ লুকালো। আহা রাজপুত্তুরের রূপের কাছে তারা যেন চুনোপুটি। কোনো অস্তিত্বই যেন মালুম করা যায় না। কিন্তু ক্ষণপরেই চাঁদ সুরুজের অধর থেকে এ লাজ দূরে গেলো। খল্‌খলিয়ে হেসে উঠলো তারা। পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা, গাছ-গাছালি সবাই আনন্দে লুটোপুটি খেলো।

আবদুল্লাহ আজ নেই। কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি তো রেখে গেলো তাপিত ধরার বুকে। বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিবের এইতো সান্ত্বনা। বারবার নাতিকে দেখে নিলেন। কে যেন গোপনে গোপনে নাতির নাম বলে গেলো। নামটি মনে পড়তেই তার মনের দরজা দিয়ে রঙিন প্রজাপতি ডানা মেলে দিলো শান্তির রাজ্যে। ওহ! কি সুন্দর নাম। মুহাম্মদ! সত্যি তো তাঁর নাতি প্রশংসাকারীরূপে সমাজে সমাদৃত হোক এটাই কামনা। মায়ের কোলে হাত পা নাড়ালো তুলতুলে কাদার মতো ছোট একটি শিশু। মুচকি হাসিতে নড়ে উঠলো ঠোঁট দুটো। মা আমিনা বারবার চুমো দিলেন তাঁর ঠোঁটে। মুখে চোখে। তাঁর দু'চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো মুক্তার মতো আনন্দাশ্রু। আজকে যাঁর গোলাপের মতো আনন্দ ছড়ানোর কথা ছিলো। এ শিশু জন্মের সংবাদে যাঁর শিরা উপশিরা রক্তের নালিতে বইতো খুশির রূপালি নদী। সেই আবদুল্লাহ অনেক পূর্বেই বিদায় নিয়েছেন এ সুন্দর পৃথিবী থেকে। মৃত্যু নামক কালো পর্দাটা পিতা ও পুত্রের মাঝখানে ছয় মাস পূর্বেই নেমে এসেছে। মাতা আমিনার এই যা দুঃখ। তা না হলে এমন সোনার টুকরো সোনামণি কোলে এলে কার না নয়ন জুড়িয়ে যায়! কলজে ঠাণ্ডা হয়!

স্বামীহারা আমিনা আস্তে আস্তে আড়াল করলেন স্মৃতির বেড়াজাল। নতুন করে তিনি ঠিকঠাক হয়ে বসলেন। তাকে ধৈর্য ধরতে হবে এ বাপহারা ঝলমলে শিশুর জন্য। একি কম কথা, এমন ছেলের মা হওয়া? আমিনার চোখ আগামী ভোরের জন্যে চিক-চিকিয়ে ওঠে। জড়িয়ে ধরেন পুত্রকে বুকের উদার জমিনে। যেখানটায় শুধু কথা কয়- মুহাম্মদ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

হালিমার ঘরে

আরবের প্রচলিত প্রথানুসারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ধাইমার হাতে তুলে দিতে হয়। হালিমা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কোলে নিয়েই কেমন যেন মিষ্টি স্বাদ পান। যদিও তাকে নিলে অল্প পয়সা হবে এই চিন্তায় মনটা বিষিয়ে ছিলো। বিষাণোও স্বাভাবিক। অন্যরা যেখানে ধনীর দুলাল পেলো হালিমা সেখানে দীনহীন এতিম বালকের জিম্মাদারী গ্রহণ করলেন। কিন্তু এখন আর সে চিন্তা হালিমার মনে পড়ছে না। মুহূর্তেই ভালবাসার চিরল চিরল পাতাগুলো ঝির্‌ঝির্‌ করে নড়ে উঠলো। ঝল্‌মলে মুখটা হালিমাকে বারবার আকর্ষণ করছিলো। সে আকর্ষণ তাঁকে মাতৃত্বের স্বাদ দিলো। মুখটা নেমে এলো কোলে ধরা শিশুটির দিকে। ঠোঁট দু'টো স্পর্শ করলো শিশুর কপোল।

কিন্তু আমিনা! দীর্ঘদিন স্বামী হারানোর ব্যথায় নুয়ে পড়া শোক ভুলে ছিলেন সন্তান লাভের সুখে। দুনিয়ার সব কিছু ভুলে মাত্র সন্তানকে নিয়ে তাঁর দিন কাটছিলো। কিন্তু হঠাৎ একি হলো? আমিনার মনে হতে লাগলো তাকে এ রূপালী রাজপুত্রের পালন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো। পরক্ষণেই মনে পড়লো প্রচলিত প্রথার কথা। তবুও মন মানে না। কাকে নিয়ে তাঁর দিন কাটবে? মুহাম্মদ ছাড়া যে তাঁর দিন চলা অসম্ভব। হায়রে মাতৃমন! কিছুতেই বুঝ মানে না। ফুপিয়ে কেঁদে ওঠেন মা আমিনা। সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে আসে একটি স্নেহের হাত। পিতৃসম শশুর আবদুল মুত্তালিব বলে ওঠেন 'মা। দু:খ করো না।' আমিনা শান্ত হয়।

দিনের সুরুজটা তার শেষ আবিরটুকু ছড়িয়ে যখন পাতালপুরীর রাজবাড়িতে অতিথি হলো পূব আকাশে তখন রূপালী একটা থালার উদয় হলো। আজকের দিনটাতে এদের সাথে কি দারুণ যোগসূত্র। পাখ-পাখালির ডানার মতো নিভাজ আকাশটা আজ কম যায় কিসে! তার বেয়াড়া সন্তান মেঘগুলোকে শাসিয়ে দিয়েছে তারা যেন দাপাদাপি না করে, যেন কোন মেহমানের মেহমানদারী করার জন্য সবাই চিন্তিত। ফুরফুরে বাতাস বইছে। নেই কোনো মাতামাতি। আবার কোনো কমতিও নেই।

মা হালিমা আজ আর বেশি রাত করেন না। তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে মুহাম্মদ এবং নিজ বাচ্চাটাকে নিয়ে বিছানায় যায়। সত্যিই সমগ্র পরিবেশটা কেমন যেন ভিন্ন মনে হলো হালিমার চোখের তারায়। চারদিকে কি সুন্দর আতর গোলাপের সৌরভ। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে সে সৌরভ গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে। তার জীর্ণ কুঠির আজ যেন বেহেশ্‌তের বাগিচায় পরিণত হয়েছে। এক সময় চোখ বুঁজে আসে। কত স্বপ্ন যে আজ তাঁর চোখের ওপর দিয়ে রেলগাড়ির মতো চলে যায় তা সে-ই জানে। সাদা-সাদা পাইক- পেয়াদা, পাঙ্খীরাজ ঘোড়া আরও কত কি তাঁর বাড়ির চারপাশ ঘুরে ফিরছে। খিলখিল করে হাসছে ধব্‌ধবে সাদা কাপড় পরা মানুষগুলো।

কিসের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় মা হালিমার। নিজের ছেলেটা দুধ খুঁজছে খাবার জন্যে। মা হালিমা তাকে দুধ না দিয়ে প্রথমে মুহাম্মদকে দিলেন। একটি খাওয়া হয়েছে মনে করে মা হালিমা অন্যটি দিলেন কিন্তু কি আশ্চর্য অন্যটি তিনি মুখেও নিলেন না। এরপর থেকে দেখা গেছে ঐ শিশুটি (মুহাম্মদ) কোনো দিনও দ্বিতীয় দুধটি গ্রহণ করেননি। হালিমা আশ্চর্য হন শিশুটির ব্যবহারে। যতই দিন যায় ততই নানান ঘটনা ঘটতে থাকে মুহাম্মদকে কেন্দ্র করে। হালিমা শুধু আশ্চর্যই হন না অভিভূতও হন। কারণ তিনি অনেক বারই দেখেছেন বালক মুহাম্মদ যখন একটু একটু দৌঁড়াতে শিখেছেন তখন এক খণ্ড মেঘ তাঁকে ছায়া দিয়ে যেতে। এ যেন রাজপুত্তুরের শান্ত্রি সেপাইরা তাঁর পাশে পাশে ছাতা ধরে যাচ্ছে। হালিমা তাঁর বুদ্ধিগুলোকে খাঁটিয়ে বের করেন এ ছেলে সাধারণ কোনো ছেলে নয়। তাই সারাক্ষণ চোখেচোখে রাখার চেষ্টা করেন। নইলে কোনো অবহেলার কারণে আগামী দিনের এ সোনালী শাহজাদার যদি কোনো ক্ষতি হয়।

তায়েফ গমন

'চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী'। রাসূল ﷺ-এর মতো পূতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী মানুষের সাক্ষাত পেয়েও আবু লাহাব, আবু জেহেলরা গোমরাই রয়ে গেলো। বুকের জেবে তালতাল অন্ধকারকেই ধারণ করে থাকলো। কণা পরিমাণ আলোও সেখানে প্রবেশাধিকার পায়নি। আবু তালিব ও হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন ইন্তেকাল করলেন তখন এই আজাজিলের পোষ্যপুত্রগুলো আবার বানরের মতো লাফালাফি শুরু করে দিলো। তারা ভাবলো এই তো সুযোগ। এখন মুহাম্মদ শোকে কাতর, তার মাথায় উপর বিরাট মহিরূহ কুরাইশ সরদার আবু তালিব নেই। ওদিকে তার মানসিক ও আর্থিক শক্তির উৎস খাদীজাও বিদায় নিয়েছে- অতএব তাঁকে শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলার এইতো সুযোগ।

শুরু হলো নতুন মাত্রায় অত্যাচার নির্যাতন। সম্মিলিতভাবে মক্কার কাফেররা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর শিষ্যদের উপর নানা উৎপীড়ন নির্যাতন শুরু করে দিলো। তাঁদের চলার পথে কাটা বিছিয়ে দেয়া হলো। মাথায়, কাঁধে, গায়ের উপর ছুড়ে ফেলতে লাগলো পঁচা দুগর্ন্ধযুক্ত ময়লা আবর্জনা ছাগল, উট, দুম্বা'র গলিত নাড়িভুঁড়ি। এছাড়া পথেঘাটে নানা আপত্তিকর কথায়, ভঙ্গিতে, ইঙ্গিতে অতীষ্ট করে তুললো। এক পর্যায়ে রাসূল ﷺ বুঝলেন আর বুঝি মক্কার মানুষের কাছে দ্বীনের কথা বলা সম্ভব নয়। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তায়েফবাসীদের নিকট দাওয়াত পৌঁছাবেন।

মক্কা থেকে তায়েফের দূরত্ব সত্তর মাইল। তখনকার দিনে গুরুত্বের দিক দিয়ে মক্কার পর ছিলো তায়েফের স্থান। তায়েফ ছিলো সুজলা সুফলা একটি অঞ্চল। এখানকার বিখ্যাত গোত্রের নাম বনু শাকীফ। নবুওয়াতের দশম বছরের শাওয়াল মাসে (৬১৯ খ্রি.) একমাত্র সঙ্গী ভক্ত অনুরক্ত পালিতপুত্র যায়েদকে রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিয়ে আল্লাহর হাবীব রওনা হলেন তায়েফের উদ্দেশ্যে।

দীর্ঘ সত্তর মাইল পথ পায়ে হেঁটে তায়েফ উপস্থিত হলেন আল্লাহর রাসূল। তিনি প্রথমেই বনু শাকীফ গোত্রের সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী তিন ভাই আবদে ইয়ালীল, মাসউদ ও হাবীবের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান জানালেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের, তারা সে দাওয়াত গ্রহণ করলো না। বরং পোড়া কপালের অধিকারী ভ্রাতৃত্রয় রাসূল ﷺ সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করলো। তারা নানা ধরনের উপহাস ও টিটকারী মেরে কথা বলতে লাগলো। একজন বললো, 'যদি আল্লাহ আপনাকে নবী করে পাঠিয়ে থাকেন তবে বুঝতে হবে তিনি কাবা ঘরের গিলাফ ছিড়ে ফেলতে বসেছেন।' আর এক ভাই বললো, 'আল্লাহ বুঝি খুঁজে আর লোক পেলেন না। আপনাকে পয়গম্বর বানালেন। পয়গম্বর কি কখনো পায়ে হেঁটে আসে? পয়গম্বর যদি বানাতেই হয়, তবে কোনো সরদার বা কোনো বড় লোককে বানালো না কেন?' তৃতীয়জন উপহাসের সুরে বললো, 'আমি আপনার সাথে কোনো কথায় বলতে চাই না। সত্যিই যদি আপনি পয়গম্বর হয়ে থাকেন, তো আপনার সাথে কথা বলা হবে বেয়াদবী; আর যদি পয়গম্বর না হয়ে থাকেন তো কোনো ভণ্ড মিথ্যাবাদীর সাথে কথা বলা অসঙ্গত।'

রাসূল ﷺ বুঝলেন এদের হৃদয়ের দরজায় মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, এরা সত্যগ্রহণ করবে না। তখন তিনি সেখান থেকে বের হয়ে তায়েফের হাটে বাজারে, বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে দাওয়াত পৌঁছাতে লাগলেন। কিন্তু তায়েফবাসীর দুর্ভাগ্য যে তারা তা কবুল করলো না। উপরন্ত বনু শাকিফের নেতৃবৃন্দ গুণ্ডা বদমাশ ও ছোটছোট ছেলেমেয়েদের রাসূল ﷺ এ পেছনে লেলিয়ে দিলো। তায়েফের নরাধমরা নবীজিকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিলো। আল্লাহর আরোশ মরু পহাড় সেই শোকে কেঁপে উঠলো। আহ্ কী বীভৎস সেই দৃশ্য। সত্যকে অস্বীকারকারী জালিম প্রকৃতির মানুষ সব যুগেই ছিলো, এখনও আছে- আগামীতেও থাকবে।

আকাবার শপথ

একদিন নবীজি ﷺ তিনি হাঁটতে হাঁটতে মক্কার নিকটবর্তী আল আকাবা নামক যে উপত্যকাটি আছে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন ছয়জন বিদেশী যাত্রী বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। সময়টা ছিলো রমজান মাস। এ সময়ে আরবগণ সকল প্রকার অন্যায় অশ্লীলতা, খুন খারাবী ও আত্মকলহ থেকে নিজেদের বিরত রাখতো। ফলে রাসূল ﷺ বিদেশীদেরকে দেখে পুলকিত মনে তাদের কাছে গেলেন। তাঁদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের পর তাঁদের খোঁজ খবর ও পরিচয় নিলেন। এরপর তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে তাদেরকে ইসলাম কবুলের আহবান জানালেন। তাঁরা রাসূল ﷺ এর কথায় মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাত তাঁরা ইসলাম কবুল করলেন এবং পরবর্তী হজ্জের মওসুমে আরও লোক সাথে নিয়ে আসবেন বলে ওয়াদা করে মদীনার পথে পা বাড়ালেন। পরেরবার ঠিক ঠিকই তাঁরা হজ্ব মওসুমে অতিরিক্ত লোক নিয়ে মক্কায় এলেন। এবার আরও ১২ জন মদীনাবাসী ইসলাম কবুল করলেন। এটি আকাবার প্রথম বাইয়াত! এভাবে ইসলামের আলো মদীনায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো।

এরপরের বছর মদীনা থেকে আরো ৭৩ জন নারী পুরুষ মক্কায় আসলেন। সংবাদ পেয়ে চাচা আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল ﷺ গোপনে তাঁদের সাথে সাক্ষাত করলেন। উপস্থিত সবাই রাসূল ﷺ এর হাতে হাত রেখে বাইয়াত হলেন। এরপর তাঁরা হজরতকে তাদের সাথে মদীনায় যাওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। তখন আব্বাস তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন- আপনারা মুহাম্মদকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, কিন্তু এটা মোটেই সহজ কাজ নয়। আগপাছ ভেবে- দেখুন আমরা সর্বদা তাঁকে দুষমনদের হাত থেকে রক্ষা করে আসছি। সব সময় তাঁকে চোখে চোখে রাখতে হয়। আপনারা কি নিজেদের জীবনবাজি রেখে নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পারবেন?

উত্তরে তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদীদের সাথে আমরা সন্ধিতে আবদ্ধ কিন্তু আপনার হাতে বাইয়াত হওয়ার ফলে সে সম্পর্ক বাতিল হয়ে গেলো। তাই আমাদের প্রশ্ন মুসলমানরা যখন সংখ্যায় বেড়ে যাবে, তখন কি আপনি আমাদের ছেড়ে আবার মক্কায় ফিরে আসবেন?

বিদায় হজ্ব

হিজরী দশ সালের ২৫ জিলকদ তারিখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সস্ত্রীক লক্ষাধিক সাহাবীকে সাথে নিয়ে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে পা বাড়ালেন। এ হজ্বই ছিলো তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ হজ্ব। এজন্য এ হজ্বকে বিদায় হজ্ব বা হুজ্জাতুল বিদা বলে। বিদায় হজ্বের কিছুদিন পর নবীজি ইন্তেকাল করেন।

জিলহজ মাসের চার তারিখে সকালবেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গীদেরসহ মক্কানগরীতে পৌঁছেছিলেন। এ সময় বিভিন্ন দেশ থেকে আরো লক্ষাধিক মুসলমান হজ্ব করার উদ্দেশ্যে সমবেত হলো। পৃথিবীর ইতিহাসে সেই প্রথম লক্ষলক্ষ মানুষের সমাবেশ শুরু হয় হজ্বে। মুসলিম মহাসম্মেলনের শুরু আরকি। অভিভূত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে নিয়ে কাবা শরীফ সাতবার তাওয়াফ করে 'মাকামে ইবরাহীম'-এ এসে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর আরাফার ময়দানে গিয়ে উপত্যাকার এক পাহাড়ে উঠে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীর অথচ মধুর কণ্ঠে ভাষণ শুরু করলেন।

হে মানবমণ্ডলী! উপস্থিত সবাই মন দিয়ে আমার বক্তব্য শোনো। কারণ আমার আশংকা হচ্ছে আগামী বছর তোমাদের সাথে একত্রে হজ্ব করার সুযোগ সম্ভবত আমার আর ঘটবে না।

হে লোক সকল! আজকের দিনটি যেমন পবিত্র এই মাস এই শহর যেমন পবিত্র তোমাদের প্রতিপালকের কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত তোমাদের পরস্পরের জান মালও তেমনি পবিত্র জানবে।

তোমরা জেনে নাও আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগের সব রকম কুপ্রথা আজ আমার পায়ের নীচে পুঁতে ফেলা হলো। তোমাদের সকল রক্তপণ আজ থেকে মওকুফ করা হলো। অন্ধকার যুগের সুদ গ্রহণের নিয়মও রহিত করা হলো। আজ থেকে একজনের অপরাধে অন্যকে দণ্ড দেয়া যাবে না। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে কিংবা পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না।

এখন থেকে সব মুসলমান ভাই ভাই। আল্লাহর চোখে সবাই সমান।

নারী জাতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। নারীর উপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে ঠিক তেমনি পুরুষের উপর নারীরও অধিকার রয়েছে।

সাবধান! ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। অতীতে অনেক সমৃদ্ধ জাতি এই বাড়াড়ির কারণেই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে।

হে মুসলমানগণ! কখনো নেতার আদেশ অমান্য করবে না। যদি কোনো নাক কাটা-কাফ্রী ক্রীতদাসও তোমাদের নেতা হয়, সে যদি আল্লাহর বিধানানুযায়ী তোমাদের চালিত করে, তবে তা নত মস্তকে মেনে চলবে।

দাসদাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। কোনোরূপ অত্যাচার করবে না। তোমরা যা খাও তাই তাদেরকে খাওয়াবে, যা পরো তাই তাদেরকে পরতে দিবে। মনে রেখো তারাও তোমাদের মতই মানুষ।

সাবধান! পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদেরকে স্পর্শ না করে। শির্ক করবে না, মিথ্যা বলবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, সব ধরনের পাপ কালিমা থেকে মুক্ত থাকবে এবং পবিত্র জীবন যাপন করবে। সত্যকেই পরম আশ্রয় জানবে।

হে মুসলমানগণ! সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলবে। মনে রাখবে অবশ্যই একদিন সকলকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং যাবতীয় কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব দিতে হবে।

বংশ মর্যাদা নিয়ে অহংকার করবে না। অপর দিকে নিজের বংশকে ছোট মনে করবে না। যে ব্যক্তি নিজের বংশকে ছোট বা নীচ মনে করে, তার উপর আল্লাহর লানত।

হে উপস্থিতি! আজ আমি তোমাদের কাছে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে-তা হলে তোমরা সঠিক পথে থাকবে। আর তা হলো আল্লাহর কুরআন এবং আমার সুন্নাহ।

এ কথা নিশ্চিতরূপে জানবে, আমার পর আর কোনো নবী আসবে না। আমি সর্বশেষ নবী। 'ইলম' উঠে যাবার আগে আমার কাছ থেকে শিখে নাও।

সমবেত উম্মতবৃন্দ! তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছো তারা অনুপস্থিত সকলের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দিও। হয়তো উপস্থিত অনেকের চেয়ে অনুপস্থিত অনেকে এই বাণী মনে রাখবে ও উপকৃত হবে।

ভাষণ শেষে রাসূল ﷺ আকাশের দিকে মুখ তুললেন। তাঁর মুখমণ্ডল বেহেশতী নূরে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, হে আল্লাহ! হে আমার রব! আমি কি তোমার বাণী পৌঁছে দিতে পেরেছি? আমি কি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পেরেছি?

সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতার কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো-

নিশ্চয়! নিশ্চয়! আবেগ ভরা কণ্ঠে রাসূল ﷺ তখন বললেন, হে আমার রব; শুনে রাখো, সাক্ষী থাকো; এরা কি বলছে, এরা বলছে আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।

ঠিক এ সময় কুরআনের সূরা মায়েদার এ আয়াতটি নাযিল হলো-

হে মুহাম্মদ আজ আমি তোমার দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমার উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। ইসলামকেই তোমাদের ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদা-৩)

রাসূল ﷺ এর কণ্ঠ হঠাৎ করেই করুণ হয়ে উঠলো। তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে বললেন- আল বিদা! আল বিদা!

ওফাত

হিজরী একাদশ সাল সফর মাস! রাসূল ﷺ অসুস্থতার খবরে- বেদনা রঙের আবির অনুভূত হতে শুরু করলো সাহাবায়ে কেরামের মাঝে। অবশ্য বিদায় হজ্ব থেকে ফেরার পর নবী করীম ﷺ এর চলাফেরায় আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। অসুস্থ হওয়ার আগ মুহূর্তে সিরিয়া থেকে বিদ্রোহের খবর এলো। রাসূল ﷺ হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পুত্র পরমপ্রিয় উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নেতৃত্বে সিরিয়া অভিযানের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁর হঠাৎ অসুস্থতায় অভিযান স্থগিত হয়ে গেলো।

দেখতে দেখতে সফর মাস শেষ হয়ে এলো। এ মাসের শেষ বুধবার রাসূল ﷺ অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। এদিন গোসল করলেন, আলী ও আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে নববীতে এলেন, সাহাবায়ে কেরামের সাথে জামায়াতে জোহরের নামায আদায় করলেন।

সফর মাস শেষ হয়ে রবিউল আউয়াল এলো কিন্তু রাসূল ﷺ-এর শারীরিক অবস্থার আশানুরূপ কোনো উন্নতি হলো না। বরং ১১ রবিউল আউয়াল অবস্থার বড় অবনতি হলো। ওজু করলেন বেশ কষ্ট করে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর ইমামতিতে নামায পড়লেন। রাতটা খুব আশংকাজনক কাটলো। ভোর থেকে নবীরি শরীর কিছুটা ভালো দেখা গেলো। তিনি হাঁটাচলা করতে লাগলেন কিন্তু দুপুরের পর হঠাৎ করেই শরীরের অবস্থা খারাপের দিকে মোড় নিলো। নবীজির নিকট স্বজন আর শোকাহত সাহাবাদের বেদনাহত মুখগুলো দোয়া ও উৎকণ্ঠায় কাটাতে লাগলো।

পরেরদিন, ১২ রবিউল আউয়াল হিজরী ১১ সাল! আম্মাজান আয়েশার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন সাইয়েদুল মুরসালিন। এমন সময় মহান রবের তরফ থেকে ডাক এলো- দুনিয়ার সফর শেষ করলেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। নবীজি ওফাত বরণ করলেন।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য
এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।